নতুন মুখ নতুন ভাষা

বুড়োশিব দাশগুপ্ত

সংবাদ মাধ্যমে নিঃশব্দে একটা বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। 'উইকিলিক্স'কে ২০১০ সালের সবচেয়ে 'বিপজ্জনক' সাইট আখ্যা দেওয়া হয় এবং জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে যারপরনাই হেনস্থা করতে থাকা হল। কারণ একটাই — এই সমাজব্যবস্থার একটা মিথ্যাচারকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের তরফে। ব্যবস্থাগুলো অনেক দিনই নগ্ন হয়ে পড়েছিল— 'রাজা ল্যাংটো' বলার সাহস দেখাল 'উইকিলিক্স'। মার্কিন সরকারে 'ক্ল্যাসিফায়েড ইনফরমেশন' তাঁরা 'হ্যাক' করে বার করে নেয়। তার মধ্যে ছিল একটি 'ভিডিও' যা মার্কিন বায়ুসেনা তুলেছিল প্লেনের ককপিট থেকে — যেখানে দেখাচ্ছি মার্কিন সেনা বাগদাতে বারোজনকে গুলি করে মারছে, যার মধ্যে দু'জন সাংবাদিক। সাংবাদিকদের ক্যামেরাকে 'ভুল' করে একে-৪৭ ভাবা হয়েছিল। প্রথম রাউন্ড গুলির পুর, একজন হামা দিয়ে আশ্রয়ের দিকে যাচ্ছিল। দেখা যাচ্ছে, একটা ভ্যান এসে দাঁড়াল তাদের বাঁচাতে। তারপর হঠাৎ আবার গুলি চালিয়ে শেষ করে দেওয়া হল তাদের। মার্চ ২০১০ -এ এই 'লিক'-এর পর উইকিলিক্স সবচেয়ে ব্যবহৃত সংবাদ সাইট এবং প্রথাগত রাজনীতিবিদদের জন্য ও প্রাতিষ্ঠানিক সংবাদপত্রের জন্যও বিপজ্জনক হয়ে উঠল।

এর পর মার্কিন সরকারের কুকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়ায় মরিয়া সরকার উইকিলিক্স -এর অর্থের পথগুলো (বেশিরভাগই অনুদান) বন্ধ করে দিতে লাগল। 'আমজন', 'পে-পল' ইত্যাদি সাইটগুলো, যার মাধ্যমে অনুদান আসত— তারা সেগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। 'আমাজন' তাদের 'সার্ভার স্পেস' থেকে উইকিলিকস্‌কে বার করে দিল। অবশ্য, তখন দেখা গেল এই নতুন সোশ্যাল মিডিয়ার আর এক উদ্ভাবনা। একদল 'হ্যাকার' —যাদের বলা যায় 'প্যাকটিভিস্ট' —তার ই সব সাইটগুলোকে ('আমাজন', 'পে -পল' ইত্যাদিকে) ব্লক করে দিতে শুরু করল। এ এক নতুন ধরনের প্রতিবাদ। সমাজে নতুন ধরনের প্রতিবাদের ভাষা জন্মাচ্ছে। তার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়েছে 'সোশ্যাল মিডিয়া'। প্রাতিষ্ঠানিক মিডিয়া থেকে শুধু প্রযুক্তিগত দিক থেকেই বেশ ভিন্ন ধরনের।

প্রাতিষ্ঠানিক মিডিয়া বনাম সোশ্যাল মিডিয়া

গত কয়েক মাসে শুরু হওয়া 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' পশ্চিমে এক নতুন ধরনের প্রতিবাদ-আন্দোলন। এই ধরনের প্রতিবাদের কিন্তু শুরু ইদানীংকালে টিউনিশিয়া বিপ্লব এবং তারপর মিশর, লিবিয়া থেকে। প্রথম প্রথম পার্কে অবস্থান। যথারীতি প্রাতিষ্ঠানিক মিডিয়া এইসব প্রতিবাদকে শুরুতে পাত্তা দেয়নি। 'সোশ্যাল মিডিয়া' ছিল এইসব প্রতিবাদের একমাত্র ভরসা। ভিন্ন ভিন্ন জায়গার খবর এরা 'ফেসবুক' এবং 'টুইটার' -এর মাধ্যমেই সংগ্রহ করছিল। নেট ছিল এদের যোগাযোগ ক্ষেত্র।

বহু তাত্ত্বিক 'ইন্টারনেট'কে 'পাবলিক স্পেস' -এর গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক অস্ত্র হিসেবে মানে। কিন্তু 'পাবলিক স্পেস' (জনপরিসর) ধারণার হোতা হেবারম্যাস কিন্তু ইন্টারনেটকে জনপরিসরের প্রকৃষ্ট অস্ত্র হিসেবে মানতে রাজি ছিলেন না। তার যথেষ্ট কারণ ছিল। নেট কিন্তু রাজনৈতিক শ্রেণিভাগ মানে না। এটা যে একটি বিপজ্জনক অস্ত্র এটা হেবারম্যাস জানতেন এবং আজ তা প্রতি পদে প্রমাণিত হচ্ছে। নেট কোনও প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটাতে পারে। ইন্টারনেটের একটা নৈরাজ্যবাদী দিক আছে যা কোনও প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক চিন্তক গ্রহণ করতে পারবেন না। নেটের মাধ্যমে 'প্রতিনিধিত্বমূলক' গণতন্ত্র থেকে যেন একটা 'অংশগ্রহণকারী' গণতন্ত্রের দিকে সমাজ এগোচ্ছে। এর ভবিষ্যৎ ফলাফল কী, তা এক্ষুনি বলা শক্ত । কিন্তু মিডিয়ার এই 'অংগ্রহণকারী' রূপ একটা নিঃশব্দ বিপ্লব।

প্রাতিষ্ঠানিক মিডিয়া— রেডিও, টিভি এবং সংবাদপত্র — সোশ্যাল মিডিয়ার এই নতুন 'অংগ্রহণকারী' রূপে বেশ ভীত। পুরনো 'আমি বলি, তুমি শোন' সংবাদের এই ধরণকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। তাই আজ টেলিফোনে প্রশ্ন ইত্যাদি দিয়ে টিভি, রেডিও নিজেদের অনেক বেশি 'অংশগ্রহণকারী' রূপ দিতে চেষ্টা করছে। সংবাদপত্র ই-মেল পাঠকের কাছে যেতে চাইছে।

তিনটি প্রযুক্তিগত আবিষ্কারকে এই নতুন মিডিয়ার জনক বলা যায় —স্যাটেলাইট, কম্পিউটার চিপ এবং ডিজিটাইজেশন। আর্থার সি ক্লার্কের ভাবনার নতুন 'LEO' কমিউনিকশন স্যাটালাইট দিল নেটওয়ার্ক। কম্পিউটার চিপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ট্র্যানজিস্টার রেডিও ওয়েভগুলোর প্রসেসিং ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। এবং ডিজিটাইজেশন' অদ্ভূতভাবে কথা, শব্দ ও দৃষ্টিকে 'এক এবং শূন্য'র ফর্মূলাতে ফেলে চালিত করল। মোবাইল ফোন আবার এইসব প্রযুক্তি গুলোর 'হাইব্রিড'।

সাধারণ মানুষ আজ সোস্যাল মিডিয়ার জোয়ারে নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করতে পারেন তার নিজের ব্লগে, ফেসবুকে, ট্যুইটারে। আমরা সবাই আজ সাংবাদিক, প্রকাশক — নিজের বক্তব্য অন্যকে শোনাতে, বোঝাতে পারি নির্ভয়ে ও বিনা খরচে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা যায়।

প্রশ্ন যখন দারিদ্র্য

প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে কিছু শতাংশ মাত্র লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে, সেখানে সোশ্যাল মিডিয়ার কী তাৎপর্য? এটা অনেকটা সারসের মাটিতে মুখ ঢেকে রাখার মতো দেশে যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা স্পষ্ট নয়, সেখানেও ইন্টারনেট এখন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত। ভারতে হবে না কেন? সামাজিক চাপটা রাখা প্রয়োজন। 'ডিজিটাল ডিভাইড' -টা ভাঙা প্রয়োজন আছে। 'আকাশ' -এর মতো ট্যাবলেটের প্রথমে গ্রামের স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন আছে, শহুরে স্কুলে নয়। কে শেখাবে এই শিশুদের? শিশুরা অনেক বেশি তাড়াতাড়ি নিজে নিজেই কম্পিউটার চালাতে শেখে। ভারতেই এর অনেকগুলো উদাহরণ আছে। গ্রামে এখন তো অনেক জায়গায় 'ব্ল্যাকবোর্ড'ই পৌঁছয়নি। নতুন প্রযুক্তি কিন্তু এই 'ব্ল্যাকবোর্ড স্তরকে টপকে যেতে পারে ঠিক মতো চেষ্টা করলে। বলা হয়, দারিদ্র্য গ্রামবাসীদের এসব থেকে দূরে রাখবে! সুন্দর বনের মতো জায়গায়, যেখানে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁয়য়নি এবং দারিদ্র্য চরম পর্যায়, সেখানে প্রতিটি ঘরে আজ মোবাইল ফোন অনেক প্রাণ বাঁচিয়েছে। মোবাইল ফোন যেমন সস্তায় মেলে এখন, তেমনই সস্তায় মিলবে 'আকাশ' ট্যাবলেট এবং ইন্টারনেটও। এক সময় 'বই একটি অস্ত্র' —এই রকম দেওয়ালে লিখন চিল। আজ 'সোশ্যাল মিডিয়া' তেমন অস্ত্র। এটা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়াটা সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। 'ডিজিটাল ডিভাইড' বলে এড়িয়ে

যাওয়াটা উন্নাসিকতার পর্যায়ে পড়ে।

প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া সংস্থাগুলো আজ অনেক দোষে দুষ্ট। প্রথমত, হয় তার কোনও রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট অথবা কোনও বাণিজ্যিক সংস্থার মুখপত্র। মিডিয়ার এই দুর্দশার সময় সাধারণের একমাত্র ভরসা সোশ্যাল মিডিয়া। এখানেই একমাত্র সবাই রাজা।

সোশ্যাল মিডিয়ার এখন নানান আকার। সবগুলোই অনলাইন পাওয়া যায় ইন্টারনেটে কিন্তু তার ব্যবহার যেন ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। যেমন 'উইকিপিডিয়া': এটা লেখা হয় কোনও একক লেখকের দ্বারা নয় সহযোগী লেখকদের দ্বারা এবং যে কেউই এতে বিষয়বস্তু সংযোগ বা বিয়োগ করতে পারে। এটা যৌথ লেখার পর্যায়ে পড়ে। এরকম যৌথ বা সহযোগী লেখার উদাহরণ নেটে এখন প্রচুর। বলা যায়, এক নতুন ধরনের লেখার প্রবর্তন করেছে সোশ্যাল মিডিয়া।

এখানে আত্মপ্রকাশে হাতেখড়িও হতে পারে, আবার, আত্ম সম্পূর্ণতাও পেতে পারে। এই বিশাল নেটওয়ার্কে এখন বহু জঞ্জাল জমা পড়েছে। আবার খুঁজতে পারলে ঠিকমতো, আছে অনেক মণিরত্নও।

সোশ্যাল মিডিয়ার এখন নানান আকার। সবগুলোই অনলাইন পাওয়া যায় ইন্টারনেটে কিন্তু তার ব্যবহার যেন ভিন্ন ভিন্ন ধররেন। যেমন 'উইকিপিডিয়া' : একটা লেখা হয় কোনও একক লেখকের দ্বারা নয় সহযোগী লেখকদের দ্বারা এবং যে কেউই এতে সংযোগ বা বিয়োগ করতে পারে বিষয়বস্তু। এটা যৌথ লেখার পর্যায়ে পড়ে। এরকম যৌথ বা সহযোগী লেখার উদাহরণ নেটে এল প্রচুর বলা যায়, এক নতুন ধরনের লেখার প্রবর্তন করেছে সোশ্যাল মিডিয়া। এমন ধরনের সাইট আছে যেখানে যৌথভাবে গল্প লেখা

জীবনযাপনের সঙ্গে ব্যাবসা-বাণিজ্যের যোগসূত্রটাও অবিচ্ছেদ্য। ভার্চুয়াল স্পেসে তো সব কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। তাহলে এই সোশ্যাল মিডিযা চলে কী করে? প্রথমে চলত না। অনেক কিছুই 'ক্লাইডে' প্রকাশ হয়ে বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যায়। কিন্তু গুগুলের ব্যবসায়িক ফর্মূলা সোশ্যাল মিডিয়কে বাঁচিয়ে দেয়। আর এখন তো সংবাদপত্র, টিভি, রেডিও রীতিমতো শঙ্কিত। অনলাইন বিজ্ঞাপনের চাহিদা এখন বাড়ছেই।

যায়, এক নতুন ধরনের লেখার প্রবর্তন করেছে সোশ্যাল মিডিয়া। এমন ধরনের সাইট আছে যেখানে যৌথভাবে গল্প লেখা যায়। কবিতাও। আধুনিক সাহিত্যেও এর প্রভাব পড়ছে। তারপর ধরা যাক। 'মাইক্রোব্লগ', যার উদাহরণ ট্যুইটার। একশো চল্লিশ অক্ষরে (শব্দ নয়) নিজের বক্তব্য পেশ করতে হবে। সেলিব্রিটি ট্যুটার আছে, রাজনৈতিক ট্যুইটার আছে, আছে সাধারণের ট্যুইটার। তর্ক - বিতর্ক, কেচ্ছা সব কিছুই। ট্যুইটারের তর্ক-বিতর্ক থেকে রাজনৈতিক ইন্দ্রপতনও ঘটেছে ভারতবর্ষের মতো দেশে। হয়েছে বন্ধু বিচ্ছেদ। কিন্তু টুইটার এমন বিশ্বময় জাল বুনেছে— এ এখন কুড়ি কোটি লোকের নেটওয়ার্ক এবং প্রতিদিনই বাড়ছে। সবাই সবার ফলোয়ার বা অনুগামী।

তবে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং -এর আরও বড় উদাহরণ 'ফেসবুক', যা এখন আশি কোটি লোকের নেটওয়ার্ক। সবাই এখানে কথা বলে, ছবি 'আলপোড' করে, গান 'শেয়ার' করে। এক বিশাল সমাজ। কচি-কাঁচারাই প্রধান, কিন্তু বয়স্করাও কিছু কম নেই। ট্যুইটারে যদি শুধু বাক্যালাপের সূত্রপাত হয়, ফেসবুকে সেই কথোপকথন চলতেই থাকে 'লিঙ্ক' ধরে। মাঝে মাঝে সেই 'লিঙ্ক' কয়েক শো'তে গিয়ে ঠেকে। ফেসবুকে ব্যক্তির ভার আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে এবং সুযোগ আরওঅনেক বেশি। হয়তো এদের মধ্যে কোনওদিন সাক্ষাৎ-ই হয়নি, হবেও না। কিন্তু তর্ক, ভাবের আদান-প্রদান চলতেই থাকে। এটা শুধু 'চ্যাট' নয়— নিজের প্রকাশ করার (মাঝে মাঝে প্রোমোট করার) উপায়ও বটে। এই ভার্চুয়ান স্পেসে থাকাটা অনেকের কাছে ফ্যাশন, আবার অনেকের কাছে নেশা। খারাপ - ভাল যাই হোক— এই ভার্চুয়াল স্পেস এখন বাস্তব, অস্বীকার করা যাবে না।

যৌথভাবে ছবি, গান ভাগ-বাঁটোয়ারা করার আর একটি উপায় 'ইউ টিউব'। যেমন, বিনামূল্যের সত্যজিৎ রায়ে অনেক ছবি এমনকি অধরা 'সিকিম', 'সুকুমার রায়' এবং 'রবীন্দ্রনাথ' পর্যন্ত। বা, ঋত্বিক ঘটকের অসমাপ্ত ছবি 'রামকিঙ্কর' -এর ওপর তথ্যচিত্র। গানও অজস্র— সেই পুরনো দিনের আঙুরবালা, কাননদেবী, মালতী ঘোষাল থেকে শুরু করে আজকের ব্যান্ড সঙ্গীত। সবার জন্যই রসদ আছে, শুধু খুঁজতে হবে। কারা 'আপলোড' করেছে তা প্রায়ই অজ্ঞাত, কিন্তু রত্নখনিটা বাড়ছেই। 'ইউ টিউব' ছাড়াও আছে অনেক গান শোনার সাইট। শুধু খোঁজা আর শোনা। সোস্যাল মিডিয়ার 'খোঁজা'টা 'সার্চ - ইঞ্জিন' -এর মাধ্যমে খুব জরুরি একটা কাজ। বইয়ের 'ইনডেক্স' বা বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচির এক নবতম ও আশ্চর্য সংস্করণ এই 'সার্চ ইঞ্জিন'। আজকাল গবেষণার যে কোনও বিষয়ই এই সোশ্যাল মিডিয়ার 'সাচ' - ইঞ্জিন' ছাড়া কি সম্ভব?' 'গুগুল' এ বিষয়ে একটা বিপ্লব হতে পারে, গবেষণা এখন 'কাট অ্যান্ড পেস্ট' -এ দাঁড়িয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। কিন্তু উপায়ও আছে ধরে ফেলার। সমাজের চোর - পুলিশ থাকবে। গবেষণাতেও গেল গেল রব তোলার কোনও কারণ নেই।

জীবনযাপনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের যোগসূত্রটাও অবিচ্ছেদ্য। ভার্চুয়াল স্পেসে তো সব কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। তাহলে এই সোশ্যাল মিডিয়া চলে কী করে? প্রথমে চলত না। অনেক কিছুই 'ক্লাউডে' প্রকাশ হয়ে বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যায়। কিন্তু গুগুলের ব্যবসায়িক ফর্মূলা সোশাল মিডিয়াকে বাঁচিয়ে দেয়। আর এখন তো সংবাদপত্র, টিভি, রেডিও রীতিমতো শঙ্কিত। অনলাইন বিজ্ঞাপনের চাহিদা এখন বাড়ছেই।

ব্যবসা-বাণিজ্যেই একটা দিক আছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। মুনাফার জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তারা দূষিত করে। আমরা 'পেড নিউজ' -এর দাপট দেখি সংবাদপত্রে। বাণিজ্যিক সংস্থা সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকবে এ তো স্বাভাবিক। 'পেড নিউজ' সম্ভব হয়েছে শুধু সংবাদ সংস্থার মালিকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েও। এই বিপণনের নতুন নতুন কৌশল তৈরি হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াবার জন্য। তবে সাধারণ লোককে অত বোকা ভাবার কোনও কারণ নেই। সতর্কতা অবশ্যই প্রয়োজন। কোনটা খবর আর কোনটা খবর নয়, এখন লোকজন ভালই বোঝে। আর সোশ্যাল মিডিয়া একটা জনসাধারণের 'কমিউনিটি' —অবাঞ্ছিত লোকজনকে বোতাম টিপেই বাদ দিয়ে দেওয়া যায়।